প্রথম প্রকাশ
অগাস্ট, ১৯৬০

প্রকাশক
গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়
কোরক প্রকাশনী
১৬৮, নারিকেল কুঞ্জ
রামকৃষ্ণ রোড
চুঁচুড়া ৭১২১০১

মুদ্রক
তাপস সাহা
তরুণ প্রিন্টার্স
২৯ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শীতল চৌধুরীর অন্য গ্রন্থ :

একাকী অলৌকিক ক্রন্দন (কবিতা)

সরল দর্পণে জঙ (কবিতা)

সাতজন একা (অন্যতম কবি)

আধুনিক বাংলা কবিতা : পাঠ-প্রসঙ্গ (যুগ্ম সম্পাদিত)

কবি ও কবিতায় : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (যুগ্ম সম্পাদিত)

জীবনানন্দ অন্বেষা (প্রবন্ধ—প্রকাশিতব্য)

অনেক আকাশ (প্রকাশিতব্য)

সূচী

তালাচাবি বাক্স চারটে বাইশ চোখ মৃত্যু সবুজ বাড়ি সূর্যলোকের শেষ আত্মীয়
ব্রহ্মলোচন মীনার চিঠি থেকে একটি জন্ম কথক একদিন ঈশ্বর নষ্ট স্বপ্নেরা
ভালোবাসা ফুলের পাপড়ি আনন্দের মাছ তাঁর মায়ালোক তিনফুট আয়না
পইঠা ভেঙে ভেঙে কিছু অলৌকিক মহাকালের জানলা তাকে কিশোরী
হেমবর্ণ পাখি বেড়াল হরি-কী-পাউরী মোতিমের জামা সিংহাসন একতারা
সময় ভাঙছি হিমযুগ জাদুকর আনন্দ উপনিষদের নৌকো আদিব্রহ্ম মাছ
মোতিচাঁদ ভাঙলে স্থিরচিত্র আনন্দ চরাচর পাখি হরিণ বাড়ি সংসার বনিতা
জ্যোৎস্নার খাপ আমি ও প্রজন্ম কামিনী-কাঞ্চন শাঁখ অমিয়-কাঞ্চন
আর্যপুরুষ প্রস্তরযুগ থেকে

তালা-চাবি

এক একবার ভাবি
হয়তো কোনোদিন ঘুমের মধ্যে
পৃথিবীর লক্ষ বয়সের ইতিহাস খুঁড়তে খুঁড়তে
আলকেউটে মানুষের ছবি ছিঁড়তে ছিঁড়তে
অবশেষে, সুন্দরের নষ্ট চোখে প্রাণ প্রতিষ্ঠায়
আকাশ-নক্ষত্র-চাঁদ দুই হাতে ছুঁয়ে
মর্ত্যে নেমে ওড়াবো আমি
অসীম বিভূতি !

এক একবার ভাবি
ঘুমের ভিতরেই একদিন পেয়ে যাবো
ঈশ্বরের গুপ্ত তালা-চাবি ;
আর, সেই তালা-চাবি হাতে
চলে যাব নির্বিকার পায়ে পায়ে হেঁটে
ওঁ স্বাহা—
প্রজাপতি ব্রহ্মার বাড়ি।

বাজ

স্বপ্নের ভেতর সে আসে। তার পায়ের জলপ্রপাত শুনতে পাই।
চারদেয়ালের ভেতর থেকে বেজে ওঠে অদৃশ্য একটা কাল
হুইসেল। ধীরে ধীরে সে আমার ঘুমন্ত শরীরের কাছে
এসে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর মশারির
খুঁটগুলো একে একে খুলে দেয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে
নিপুণ শিল্পের ছন্দ বাজে। একে একে চুম্বন করে
আমার সমস্ত শিরা-উপশিরা! কিন্তু—স্বপ্নের ভেতরেই
সে চলে যায়। কোনও হুঁশ থাকে না। ঘড়িতে তখন
ঢং ঢং করে বেজে ওঠে—ভোর চারটে! একটা বেড়াল
লাফিয়ে চলে যায় খাটের বাজু থেকে খোলা রাস্তায়!

চারটে বাইশ

চোখের পাশ থেকে সরে যাচ্ছে মেঘ। সূর্যের আলোয় ভ্রমর উড়ছে হাওয়ায়। নদীর জলে বসন্তের মুখ। মগজে ফেরাইয়ের গান। ঝরণার দেশ থেকে উড়ে আসছে ঘুঙুরের শব্দ।

প্রতীক্ষা নয়। ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে; আমাকে যেতে দাও—চারটে বাইশে ট্রেন!

চোখ

ও কার চোখ ? বার বার ছুঁয়ে যায়
হাড়মাংস, রতিরঙ, তুরুপের ঘর !

প্রেমে ও অপ্রেমে
হত্যা করে এক কোটি মানুষের
অভিজ্ঞান, মৈথিলী সুখ ; আর
অবক্ষয়ে কুরে খায়
লবকুশ, সীতার মাতৃত্ব স্বাদ
যা শাদা পায়রার মত বহুকাল
উড়েছে আকাশে স্বপ্নে ও মমতায়—

ঐ চোখ স্বপ্নে ও ঘুমে
কুঞ্চিত ভাঁজে ভাঁজে কুলকাঁটা দেয়
শিল্প ও সাধনায় ; যা অগ্নি
তিল তিল চুষে খায়
মৌন ব্রহ্মাণ্ডের সব ধ্যানী মুখ

ও কার চোখ ? অমরাবতীর পথ ঘুরে
কখনও যাযাবর, ভবঘুরে গায়েন
কখনবা নারায়ণ—
একা একা নাচায় মহাকাল
কালিদাসের ভূলোক আঙুল !

মৃত্যু

অন্ধকারে একে একে ভেঙেছে
শখের কলম, অনন্ত বাদাম।
শাদা রোদ্দুরের মন্ত্রমুগ্ধ চোখকে
পাঠিয়েছি নির্বাসনে ; গাঢ় ঘুমে
তিনি বুঁদ, আঙুলে আর নেই
পাইন গাছের শব্দ, মৌরীবনের ঝড়।

দু'চোখ থেকে উবে গেছে তার
রজনীগন্ধা বনের আলোর দরজা
গৈরিক সূর্য !

বরফের কফিন এসে ছুঁয়েছে তাকে।

সবুজ বাড়ি

আমাদের একটা সবুজ বাড়ি আছে।
সেই বাড়িতে আমি আর মীনা
প্রায়ই বসে বসে সময় কাটাই
গল্প করি ; জানলা খুলে
মুক্ত হাওয়ায়
পরস্পর আয়নায় মুখ দেখি।
বাড়ির ভেতরে আছে
একটা পৃথিবীর মানচিত্র, ক্যালেণ্ডার
একটা কলম ও কালির দোয়াত।
নানা স্বপ্ন বুনতে বুনতে
দুজনেই পৌঁছে যাই পৃথিবীর
অসংখ্য শব্দ আর অক্ষরের ভেতরে।

কখনও কখনও দুজনে আবার
সেই বাড়িটার দিকেই অপার বিস্ময়ে
তাকিয়ে থাকি—
বাড়িটার দেয়ালে-দেয়ালে
আঁকা আছে
অজস্র রোদ্দুর, বৃষ্টি এবং
লক্ষ চাঁদের ঠিকানা!

সূর্যলোকের শেষ আত্মীয়

১

কবির শরীর আছে শুয়ে বিষণ্ণ চাদর গায়ে
একা গাঢ় ঘুমে ; চারপাশে জঙলী রাত
সন্তকাটা লাশের রক্তের মতো ভয়ঙ্কর !
পারাবত নেই কোনোখানে ······

২

টিকটিকি রয়েছে বসে ; চোখে তীব্র ক্ষুধা
ভক্ষণে খাবে সে মনুষ্য পাঁজর ;
কাঁটা নেই, কম্পাস মূর্ছায় কাতর
ভূলোকে দেবতারা জিভ কেটে বধির

৩

বাতাসে তুরুপ নাচে সাঁড়াশী দস্যু
এই বুঝি ভেঙ্গে যাবে তাসের রোমাঞ্চ ;
জটিল জীবন পথে নষ্ট কুসুমেরা
রাতারাতি নগরীর রাণী হয়ে যায় ।

৪

নবীন ঘুড়ির সুতো উল্টোহাতে ধরে
অঝোরে কাঁদে চুপ নন্দকিশোর ;
রেললাইন ভাঙা পথে ফিরিওলা বেশে
জলের শেকল ছিঁড়ে চলে যায় আমাদের

মনোহর সূর্যলোকের শেষ আত্মীয় !

ব্রহ্ম-লোচন

১

কথা ছিল একদিন আমাদের দেখা হবে
আলোর সেতুর ওপারে ; সাক্ষাতে ঘটবে পরিবর্তন
মেঘ ধুয়ে নামবে বৃষ্টি বকুল বাগানে
পাথরের ঠোঁটে হবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা নতুন প্রজন্মের

২

শরবন নদী দেখে পিছুটান ফেলে
যুবক সকালে নৃত্য হবে তুমুল বসন্তের ;
সব দরজাই থাকবে খোলা—অবারিত সকলের
আরশিতে পড়বে ছাপ ব্রহ্ম-লোচনের !

৩

সৃষ্টির আঁচল ধরে গভীর দুজনে
দু'হাতে বাজাবো শঙ্খ, —তারপর দু'চোখের পাতায়
একে একে গেঁথে নেবো সব শব্দ-ছন্দের মালা
ভবভূতি ও কবি কালিদাসের ।

মীনার চিঠি থেকে

১

মীনা লিখেছে ক'দিন আগে ও স্বপ্নের মধ্যে দেখেছে :
একটা সমুদ্রকে গিলে নিচ্ছে একটা চতুর বেড়াল
চাঁদকে টুকরো টুকরো করে মাটিতে আছড়ে
খেলা করছে একটা উলঙ্গ শিশু
আর একটা জঙ্গলের ভেতরে ঘুরপাক খেতে খেতে
বৃদ্ধ বয়সের খোলস পাল্টে হঠাৎ যৌবন ফিরে পেয়েছে
একদল বেদুইন

২

স্বপ্নের মধ্যে ও আরও দেখেছে
একটা মহাদেশকে খান্ খান্ করে ভেঙে ভেঙে
কয়েকজন বিজ্ঞানী নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করে
দর্পণে মুখ রেখে হো-হো করে হাসতে হাসতে
একদল কবির কাছে জানতে চাইছে :
আগামী দিনের পৃথিবীর খবর

৩

মীনা আরও লিখেছে ও স্বপ্নের মধ্যে
একটা বিশাল সাপের ফণায় পা দিয়ে
শূন্যে উড়তে উড়তে নিচের দিকে চোখ পড়তেই
বিস্মিত ভূলোকে একটা উই ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে
অঝোরে কাঁদছে কৃষ্ণ

৪

সবশেষে মীনা তার চিঠিতে জানিয়েছে
স্বপ্নের মধ্যেই ও ঘুমতে ঘুমতে দেখেছে
অসংখ্য বামন মানুষের দিকে তাকিয়ে
হিমালয় থেকে নেমে এসে স্বয়ং শিব
দু'হাতে বিলি করছেন
পাপ এবং পুণ্যের ঠিকানা !

একটি জন্ম

গতকাল একজন নবজাতক এসেছেন
আমাদের আলো-আঁধারির ঘরে।
নতুন সন্তান পেয়ে তার মা
ভুলে গেছে দুঃখ, আর দুঃস্বপ্নের ঘেরা রাত্রির কথা।

পিতাও তাই মশগুল হয়ে গাঁজার আড্ডায়
দু'চোখ ভরে স্বপ্ন দেখছেন
একরাশ ফসলের গন্ধ, নতুন নবান্নের!
শুধু বৃদ্ধা ঠাকুমার মুখের সব কটি রেখা স্থির ;
গত বছরের খরার পর চোখে তার স্বপ্ন নেই—
শীতের রোদ্দুর পোহাতে-পোহাতে কেবল
গণিতের মতন একটি একটি করে
মারছেন উকুন!

কত্থক

দেবী পুড়ছে ষোলকলা ভেঙে সংসার সমুদ্রে ;
শহরের চিত্রিনীরা দেখেশুনে হি হি হেসে
আকাশরোদ্দুরে কত্থকনৃত্যে মেতে
পতঙ্গবনে বাজায় মায়ার পাখোয়াজ।
নবীন সন্ন্যাসী এক দূর থেকে ভয়ে ভয়ে সরে
কদম্ব গাছের নিচে ধ্যানমগ্ন হয়।
দেবী পোড়ে ; শ্মশানের চিতার ধোঁয়ায় শুধু
ঈশ্বরের করুণ মুখ ম্রিয়মাণ
প্রোজ্জ্বলতাটুকু উবে যায় হাহাকার বাতাসে !

একদিন ঈশ্বর

ওড়ফুল জামা গায়ে একদিন ঈশ্বর
প্রদক্ষিণ করলেন আমাকে ;
আমার আত্মার গায়ে তিনি
এঁকে দিলেন লাল ত্রিকোণ ।

আমার শরীরে চকিতে নামলো তখন
ভীষণ ভূকম্পন ঝড়
আমার রক্তে দোলা দিয়ে
খান্ খান্ হল বনানীর ঘড়ি ।

আত্মার গায়ে দেখা দিল ঘাম
আর পৃথিবীর পাপ-পুণ্য মাছেদের
রূপোলী আঁশের গন্ধ ;
যার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না ।

ঈশ্বর কিন্তু, একবারও ওড়ফুল জামা গায়ে
আমাকে প্রদক্ষিণ করে বললেন না :
এই নাও বায়ু
এই নাও অগ্নি
এই নাও উচ্ছল নদী ও পাখি
আর, এই নাও তোমার আত্মার প্রিয়
মায়ালোকের অন্তর্লীন রহস্যের চোখ !

নষ্ট স্বপ্নেরা

নষ্ট স্বপ্নেরা এখনও কি দারুণ তাঁত বোনে আমার মগজে ;
পাইথনের মতো রাত্রিকেও ভেঙে তছনছ করে
অদৃশ্য বাতাসে ওড়ায় কৃষ্ণের বাঁশি
নষ্ট স্বপ্নেরা দারুণভাবে আমার মনের ভেতর গড়ে বসতি।

এক-এক সময় আমাদের ভেতরে
ইন্দ্রিয়ঘড়ি বেজে ওঠে, অতর্কিতে খুলে যায়
সমুদ্রপারের বাতাস-জানলা ;
কানের ভেতর প্রচণ্ড উল্লাসে কে যেন শোনায়
আরব্যরজনীর অলৌকিক গল্প।

নষ্ট স্বপ্নেরা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে
চারপাশে ছড়িয়ে দেয় অফুরন্ত ক্লোরোফিল !

ভালোবাসা ফুলের পাপড়ি

ভালোবাসা ফুলের পাপড়ি।
ছিঁড়ে নিলে কুৎসিত
দগদগে ঘা
পৃথিবীর ব্যাধি—সৃষ্টির যন্ত্রণা
যা শত মলমেও শুকোবে না।

এতক্ষণ বন্দনা হল।
এবার কিছু খেলাছলে
এসো হে নগরলক্ষ্মী
দেখি, হাতের তালুতে তুমি
কত জাদু ধরো
কাঞ্চন, না কামিনী ?
বেঁধে ফেলো দেখি
টপাটপ আস্তাবলের অবাধ্য
একচক্ষু রক্তবর্ণ ঘোড়াকে !

ভয় কি ? এসো, দেখি—
রূপের কায়দাকানুন
কত অস্ত্র ধরে
সকাল-দুপুর ও গোধূলিবেলায়
নীলকণ্ঠ কবির তলোয়ারের
আগুন ও ঝংকারে !

আনন্দের মাছ

কয়েকজন কবি চায়ের পেয়ালায় তুফান উড়িয়ে
বায় অশান্ত ঢেউয়ে ক্ষেপনী
দু'ঠোঁটে ভরপুর ঠাসা চৌতিশা ;
ভূমণ্ডলে নির্দিষ্ট রাখেনি ঠিকানা, পরগৃহবাসী হয়ে
খুঁজে চলে সর্বত্র আপন আত্মার সঙ্গে
কোটি আত্মার মিলিত পাণ্ডুলিপি
যা প্রকাশে ক্ষেমঙ্কর, গুপ্তজ্ঞানের খইচুর।
কি ঠাস বুনুনি চালে ওরা ক'জনা শৌখিন কবি
বাতাসে ভাসিয়ে রাখে খেপ্‌লা জাল
টপাটপ্‌ যদি ওঠে আনন্দের মাছ !
আমিতো দেখে শুনে ভ্যাবাচ্যাকা ;
মুখে নেই রা,—গপাগপ গিলবো না'ক
ঠাকুর ঘরে লুকিয়ে রাখা যত আছে কেনি ?
ভাবতেই মূর্চ্ছা যাই , আমার অঙ্গজুড়ে
নেমে আসে এক বিষাক্ত কাকোদর।

তীর

অদৃশ্য থেকেই একজন ছুঁড়ে দিল তীব্র বিষ তীর
আমি দু'হাতে বাতাস উড়িয়ে হটিয়ে দিলাম
মুখ ঘুরিয়ে দিলাম অন্যদিকে।
তবু, সে ফের ছোঁড়ে তীর
এবার সরাসরি হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে।
ফের যুদ্ধ, এভাবেই বেশ জমে ওঠে শতরঞ্চ খেলা ;
যা দিনে দিনে আমাকে দীক্ষিত করে
সসাগরা ধরিত্রীর যুদ্ধে।
আমি যতবার শিরস্ত্রাণ এঁটে
দু'চোখের পর্দায় সূর্যঘড়ি এঁকে
দাঁড়াই সম্মুখে , মুহূর্তেই আকাশপথ থেকে
নেমে আসে এক দঙ্গল বেদুইন ঘোড়া।
আর আমাকে সেলাম জানিয়ে এক যুবা অশ্বারোহী
আগুনের জামার বোতাম খুলে বলে :
হাতে বিশ্বকর্মার বন্দুক—বলুন, শত্রু কোথায় ?···
আমি অমনি চারপাশে চোখ ঘোরাতেই দেখি
বাতাস-জল, আর অগ্নির ভেতরে এক সংক্ষোভ !

মায়ালোক

আহা! কি তীব্র এই ইন্দ্রিয় মায়ালোক! শরীরে ধরায় জ্বালা, মাদকের আগুন। ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানী সাধকের যুগে যুগে ভাঙে ধ্যান! যেমন ধ্যান ভেঙে ছিল বিশ্বামিত্রের। ক্ষণকালের জন্যে ভবার্ণবে বন্দী হয়েছিলেন মুনি পরাশর।

এক হাঁটু রোদ ভেঙে তার সামনে দাঁড়াতেই
খুলে যায় মায়ালোকের দরজা;
ফটাফট্ চারপাশে জ্বলে ওঠে চাঁদ
হৃৎপিণ্ডে লাফায় নর্তকীর জাদুমন্ত্র-নূপুর।
স্তম্ভিত আমি; ধমনীতে জ্যোৎস্নার ক্রকচ।
যতই সংকুচিত হয়ে তিন-পা পিছিয়ে
নিমগ্ন হতে যাই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে,—ততই
ঘুষকীরা চেপে ধরে হাত, তারপর একে একে
পতঙ্গবনের তীব্র কামনার আঁচে
পোড়ায় আমার অক্ষরজ্ঞানের দীপ্তচক্ষু, মরকত-মণি!

তিনফুট আয়না

একদিন দুঃস্বপ্নে তিনফুট আয়নার সামনে দাঁড়াতেই
আঁতকে উঠি, এ' কি ! আমার পাশে আরেকটা আমি
শুয়ে আছে, তির্যক চাহনিতে তার
ভৎর্সনা, ক্রোধ, ঘৃণা।
চোখবুজে ভয়ে ভয়ে মন্ত্র আউড়ে স্মরণ করি
পদ্মযোনি পিতাকে, হঠাৎ ওমনি নড়ে ওঠে
নৃলোক কাঁপিয়ে একটা বিশাল পিপুল গাছ।
উর্দ্ধশ্বাসে ভূলোকের পাপিয়া সব
উড়ে যায় পরব্যোমে ;—একটা পতনের শব্দে
তারপর ঘুম ভাঙতেই দেখি :
ঢং ঢং ঘড়ির কাঁটায় ভোর পাঁচটা।
একা আমি শুয়ে আছি, ঘর ফাঁকা—
আমার সম্মুখের দেওয়ালে শুধু
শৌখিন ফটোয় হাসছেন বালক কৃষ্ণ !

পইঠা ভেঙে ভেঙে

পইঠা ভেঙে ভেঙে কেউ যায় স্বর্গে, কেউ যায় নরকে। যুগে যুগে চলে ভবার্ণবে এই খেলা। পইঠা ভেঙে ভেঙে যুধিষ্ঠি গিয়েছিলেন স্বর্গে।

দুই-পইঠা ভাঙতেই
জ্বলে ওঠে অগ্নি :
ওঁ স্বাহা—মন্ত্র আউড়ে
ফের উঠি
তিন-পইঠা ভাঙতেই
অক্ষরজ্ঞান, জলছাপ
দিব্য আয়নার !
এইভাবে কয়েক পইঠা ভেঙে ভেঙে
যখন পৌঁছই স্বপ্নময় লোকে
দেখি, সামনে-পেছনে রাশি রাশি
তয়ফার মুখ
ঘুষখোর মুখ
দেবী হয়ে পুড়ছে ;
আর আমি, ভবঘুরে কবি
নেহাৎই এক সাধারণ মানব
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে
যজ্ঞের পূজারী, দু'হাতে ধরে আছি
পেতলের ঘণ্টা
আমার চোখের পাশ থেকে শুধু
পিছলে যাচ্ছে সময়, কাল
ঈশ্বরের শাদা ঘোড়া।

কিছু অলৌকিক

জানলার ওপার থেকে চাইতেই
বুকে বিঁধলো ঠোঁটা ; জখম ফুসফুস
শুরু হল কিছু অলৌকিক।
চোখের পাতায় নামে শ্রাবণের ময়ূর
নৃত্যপর অকস্মাৎ আমার ধমনীতে লৌকিক কাম ,
মূর্ছা যাবো ? পূর্বদিকে চাইতেই এক সারি পাখি
ফট্‌ফট্‌ শব্দে উড়ে যায়।
কবিতার কাছে যাবো ? শব্দকে জাগাবো ধ্বনি জেলে ?
ব্রহ্মের কাছে প্রার্থনায় বসলে : সব পাওয়া যায়
শব্দ, চিত্রকল্প, ছন্দের মূর্ত বারান্দা, মৌসুমী ফুল
কলমের ডগায় যা লক্ষ নক্ষত্র হয়ে জ্বলে।
মরকত হীরার মতন, স্পর্শে ইন্দ্রিয় ভেদে
একেবারে ঋতুমতী চাঁদ, সোহাগের জ্যোৎস্নায়
অমৃতের ফুল, ফল-বীজ ও প্রজনন।

মহাকালের জানলা

মর্তুকাম পুরুষ এক কবির কাছে দাঁড়াতেই
মরুদ্যান হৃৎপিণ্ডে তার নেচে ওঠে মউলের রতিগোলা পাখি
হাজার দুঃখের ছিটকিনি ভেঙে অতর্কিতে খুলে যায়
মহাকালের জানলা—
গুড়ি গুড়ি হেঁটে হেঁটে চলে আসে
মনের ভেতরে এক উজ্জীবিত মন
কাম-কলায় ক্ষেমঙ্কর, ঘোরায় বিষ্ণুচক্র !
কবির কাছে মর্তুকাম পুরুষ একে একে ফিরে পায়
পদ্মযোনি পিতার মন্দাকিনীর অপার সৌন্দর্য
গুড়ফুল জামার আগুনের বোতাম।

তাকে

আকাশ মন্থন করে খুঁজে চলেছি তাকে। যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল আমার কৈশোর বয়সে। যার উজ্জ্বল আলোর ছটায় কতবার খুলে গেছে পাথরের খিল, গোপন শ্লেটের বোবামুখ, বর্ণপরিচয় পাঠের জটিলতা, আর মননের ত্রিভুজ আলোর মরকত-সিঁড়ি। আকাশ মন্থন করে খুঁজে চলেছি—শহর পেরিয়ে মায়াময় গোলকের ইতিহাসের পাতা ছিঁড়ে অবিরাম উদ্দাম বেগে। আমার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে গান ধরেছে এক পল্লীর বাউল। ···দ্রুত বদলে যাচ্ছে আমার দু'চোখের সামনে থেকে বয়ঃসন্ধিক্ষণের নক্‌শী চাঁদের ভূগোল, মুনীদের মউলবনের সংলাপ। আমার মগজে এখন কয়েকটা স্মৃতি কয়েক লক্ষ পাখি হয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে; তাদের বন্ধনের তীব্র আর্তনাদ! ···এই মুহূর্তে আমি কিছুই ভাবতে পারছি না, ক্রমশ বদলাচ্ছি নিজেকে, এমনকি আমার অহংকেও!

কিশোরী

পুরনো কাঁথায় নকশা আঁকতেই
একটি কিশোরী চুম্বন করে বলল :
এই নাও আগুন
এই নাও দংশন
এই নাও ঝাউবনের পাখি।
আমি স্তম্ভিত ; শীতল কফিনে দেখি ঝড়
গুপ্তজলে পা ডোবাতেই রাশি রাশি লজ্জা, আর ঘৃণা
তাড়া করে ; যতই লুকোতে যাই নিচু হয়ে
নিম্ন উপত্যকায়, দেখি হি হি বাতাসে
খুলে যায় শরীরের মৌন জানলা।

একটি কিশোরী বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয়
ফুলহীন, ফলহীন অলৌকিক ভূগোলে!

হেমবর্ণ পাখি

মনের খধুপ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে জন্ম নেয় যে হেমবর্ণ পাখি
আমি তাকে খাঁচার ভিতরে রাখি ; প্রতিদিন
দানাপানি দিই, জল দিই।
ক্ষোভ নেই [redacted] যদি সে কখনও উড়ে যায়
কোনও এক অঘ্রাণের দিনে।
বরং সে একদিন উড়ে গেলে
আমি শোনাবো তোমাদের
শরীরের গুপ্ত কথা :
অগ্নি
বায়ু
আর জলে হৃদয়ের ভেতরের
বিঘট্টন, বীজীপুরুষের পুরুষ প্রকৃতি
কতবার ভাঙে-গড়ে, গড়ে-ভাঙে
আয়না ও চিরুনীতে।

বেড়াল

ওৎ পেতে বসে আছে একটা বেড়াল
দু'চোখে তীক্ষ্ণ আগুনের গোলা
নখে-নখে আঁচড়াচ্ছে নকৃশী চাঁদের মাটি
ফলন্ত জ্যোৎস্নার ডালপালা, প্রজন্মের উদ্ভিদ ;
ও কি খাবে হাড়-মাংস সব ?

শরীরে ভয়, স্নায়ুযুদ্ধ , মগজে ওলোটপালোট
হাওয়া, বুঝি শেষ হয়ে যাবে
আলোর ইঁটের বাড়ি, বোধের নির্মাণ
হেমবর্ণ পৃথিবী।

স্বপ্নের ভেতরেও দেখি বেড়াল
তাক করে আছে : খাবে না'কি
চিত্রিত জাহাজের শখের পাখিটিকে !
ঘুম আসে না, বাহান্ন তাসের
বাহান্ন খেলায়
শরীর ভাঙছি, মন ভাঙছি
তবু বেড়ালটা ওৎ পেতে থাকে ;
ঘড়ির ডায়ালেও পড়ে তার
তীব্র বিষাক্ত নখের আঁচড় !

হরি-কী-পাউরী

আগুনের পইঠা ভাঙছি
সরল নয়, জটিল জনজীবন
চেয়ে চেয়ে দেখছে আমাকে ; দেবমুখে আমি
গুঁজে দিই নীলপদ্ম, বিভূতির উচ্ছ্বাস !
যারা গোপনে-গোপনে চাখে নারী ও মদ
তাউসে বসে বসে দেখে হাজার মুদ্রার অঙ্গ-ভঙ্গিমা
তাদের মুখে আমি ছুঁড়ে দিই কাকের পুরীষ ।
আগুনের পইঠা ভাঙছি
জটিল জনজীবন তির্যকভঙ্গিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে
আমার গুপ্তমন্ত্রের গুণাগুণ, চৈতন্য-পপিহা ;
লক্ষ লক্ষ উজ্জ্বল গাছ কিরকম আলিঙ্গনে
নয়নে ঢেলেছে মধু, পিলসুজে গব্য-ঘি ।
আর দোরাখা বস্ত্রে অঙ্গ ঢেকেছে নর্তকী,
নামমুদ্রা হাতে তরঘাটে ছড়াচ্ছে প্রেম
সরল নয়, জটিলে পুড়ছে মন ;
পাপে নয়, প্রকৃতই শুদ্ধাচারে ।
আমি কি এখন,
জাদুবলে সুখ-দুঃখের ধুকড়িতে-ধুকড়িতে
এঁকে দেবো হরি-কী-পাউরী ?

আমি ভাঙছি আগুনের পইঠা ।।

মোতিমের জামা

স্বপ্নের আকাশ থেকে আমি
তোমাকে দিলাম মোতিমের জামা, মহার্ণবের
নুপুরের ঢেউ। অথচ, হরঘড়ি ধরে সম্পূর্ণ বদলে গেলে
জলের গভীরতা পায়ে-পায়ে ভেঙে!
তুমি কী তবে আগুনে পুড়িয়ে নিজেকে পুণ্ডরীকে চাও ঋড় ?
আয়নায় শিলাবৃষ্টি ? না' কি গুপ্ত-আসনে বসে-বসে নখে-নখে
ছিঁড়ে চাও ভোজ মহামাংসের ? —বাতাসে হিম,
সমতলের সংসার বেদনায় নীল। আমি একা
যাযাবর বাঁশি হাতে ঘুরছি এখানে ;
হাতে নেই বেদমন্ত্র-গীতার উজ্জ্বল শ্লোক
যা দিয়ে তাড়াতে পারি পেরেকের দংশন।

স্বপ্নের আকাশ থেকে কেবল পেড়ে দিতে পারি
তোমাকে মোতিমের জামা। আর মহার্ণবের
নুপুরের ঢেউ। ইচ্ছে করলেই তুমি মনের ভেতরে
এক দেবীমন নিয়ে হয়ে যেতে পারো
আমার বন্ধ্যাভূমিতে
একটি উজ্জ্বল ফলবতী গাছ॥

সিংহাসন

গজকচ্ছপের যুদ্ধ শেষ। এসো, আমরা অন্ধকারকে
সরিয়ে দিই চৈতন্যের অগ্নিদগ্ধ-তীরে!
এখন কোনোমতেই অন্ধকারে অবগাহন নয়;
এসো, শুভ্রবস্ত্রে বসি সূর্য-উপাসনায়।

গজকচ্ছপের যুদ্ধ শেষ। এসো, পবিত্রতায়
আমরা দুজনে আত্মার ক্ষত ধুইয়ে
দু'হাতে তুলে আনি স্বপ্নের অলৌকিক সিংহাসন!

একতারা

তাকে তুমি দিয়েছো
আগুনের জামা
আমি দেখছি
হড়্‌পি ; ছুঁলেই
গজকচ্ছপ।
আমি তাই
অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে
দিয়েছি নৃলোকের
প্রেম ও প্রকৃতির
প্রজ্ঞার অঙ্গুরীয় ;
জাদু নয়,
গুপ্তবিদ্যা নয়—
আর দিয়েছি
বাউল-মনের
একতারাটি।

সময় ভাঙছি

যেখানেই দাঁড়াই দেখি ছাদ নেই।
খোলা আকাশ আমাকে বিদ্রূপ করে ;
নিজেরই প্রতিবিম্ব নিজে দেখে আঁতকে উঠি
অকারণে শাস্তি পাই, যন্ত্রণার বমনে
কী করুণ মুখ দেখি স্বপ্ন-পাখিটার।

যেখানেই দাঁড়াই দেখি সিঁড়ি নেই।
নির্জনতা আলপিন ফোটায় হৃৎপিণ্ডে ;
একা নিশ্চুপ, সহ্য করি—বেত খাই।
(বংশপরিচয় সব গোল্লায় যায়,
আত্মীয়রা আড়ালে দাঁত-টিপে হাসে,
নৃত্য করে আগুনের পোশাক পরে
গোপন শত্রুরা।)

নিজেই নিজেকে ভাঙবো ? হাড়ে-মজ্জায় ?
মহাশ্মশানের অঙ্গার জ্বেলে ছারখার
এই দীপ্ত যৌবন, মহাবোধি চক্ষু !

একা একা সময় ভাঙছি ভবার্ণবের
রক্তডায়াল ত্রিকাল-ঘড়ির !

হিমযুগ

মূর্তি কই? সেই মূর্তি, হুবহু
যাকে আমি স্মৃতিপটে তুলে এনে
দশটি বছর দিয়েছি
শুভ্র ফুল, সুগন্ধি ধুপ।
নির্জনতায় যার কাছ থেকে
কুড়িয়ে এনেছি মুঠো-মুঠো
প্রজন্মের শ্লোক!

কই সেই উজ্জ্বল চোখ? চৈতন্যে
যাকে পেয়ে কতদিনে হেঁটে গেছি
বাউলের মতোন ঢেউভাঙা ভবার্ণবের
প্রজ্ঞার কিনারে।

আমি হাতড়াচ্ছি ঘর-দোর
মনের ভেতর-বাহির···

যতই পইঠা ভাঙছি
চারপাশে মনে হয় হিমযুগ।

জাদুকর

দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে আছে ঈশ্বরের তন্বী, দু'চোখে শুধু মহানিদ্রা ; নদীতটে গাংশালিক নেই। গুপ্তকক্ষ খুলে দেখি দিব্য আত্মার চোখে জল, কাঁদছে অঝোরে। এ সময় কি করে গর্জন তৈল ঢেলে গড়ি প্রাণবন্ত শিল্পের শরীর, ঘা তীক্ষ্ণ—ছুঁলেই বজ্রপাত গুপ্ত হোজে ; ক্ষয়িষ্ণু আত্মারা সব নব্য প্রাণ পেয়ে স্বপ্নলোকে দেখবে দেবী নিজ আঙুলে ইহলোকে বাজাচ্ছে সেতার। সবুজে ব্যাপ্ত চরাচর।

কই বর্ণময় প্রজ্ঞার চোখ? কই মহাকালের জাদুকর? দিকভ্রান্ত আমাকেও সরীসৃপের অন্ধকার থেকে টেনে নিয়ে যাবে বোধের অনন্ত আত্মার আলোয়— যে রশ্মি মেখে দশ আঙুলে আমি সহজেই টপাটপ্ এঁকে নিতে পারি নিপুণ রঙের প্রলেপে মানুষের আত্মার বর্ণালী অর্ক ও মন্ত্রগুপ্ত অবনী॥

আনন্দ

শৌখিন নগরপ্রেমী হয়ে
একটা বাড়ির কথা ভাবতেই
মাথার ওপরে চক্রবৎ এক কাক কর্কশ ডেকে উঠে
সবুজ জমিতে নেমে খেয়ে নেয় সব
মন্ত্রদীক্ষিত গাছ, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল।
ধূম্র হাওয়ায় ঝাপসা আরশি ;
বিকৃত মুখের চেহারা শুধু দেখা যায়।
গায়ত্রী ব্রাহ্মণের শ্রীমুখ কই ? প্রশ্ন করতেই
মগজের শিরার ভেতরে শুরু হয় খণ্ডযুদ্ধ অসীম যন্ত্রণার।
পরিবর্তন আকাশ চাই ! —ভাবতেই ভেঙে ফেলি
মনে মনে ইট-কাঠ-পাথরের বাড়ি।

পুণরায়, ঝলকে ওঠে উজ্জ্বল পৃথিবী ঝাপসা আরশিতে ;
ক্ষণে-ক্ষণে শিহরণ, প্রজ্ঞার চমক ভাঙে সমুদ্রের ঢেউ
গুপ্ত ঘুমন্ত পক্ষির আলোর ডানার মহাকাল শরীর !
বাতাসে বেজে ওঠে দেবদুতের শাঁখ, হৃৎপিণ্ডের কপাট খুলে
চেতনার চোখ বলে ওঠে : ছাখ—কত আনন্দ আপনিই গেঁথে গেঁথে
গড়ে ওঠে ; ইট-কাঠ-পাথরের বাড়ির চেয়েও দামী
মহামূল্য দীপ্তপ্রভার নক্শীতে ভরপুর।
ছুঁলেই মুক্তি, চৈতন্যের বাড়ি !

উপনিষদের নৌকো

চারপাশের ঘোর কাটাতে না কাটাতেই জঙলা দিন ;
ডিমভাঙার মতন চাঁদ টুপ করে পড়ে গেল জলে।
হাই-তুলে ইন্দ্রিয় রামধনু ভাঙতেই হাওয়ায় বেজে ওঠে
মদনের বাঁশি। আর একটা কালসাপ ধীরে ধীরে
গিলে নেয় কুলীনের মোহর। নদীর কিনারে যাবো
গাত্রস্নানে! —ভাবতেই পিছলে ত্রিকাল-ঘড়ির কাঁটা
আটকে যায় বেতের জঙ্গলে। এমন সময় এক বুনো
ইবলিস শাল-পিয়ালের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে
কামজালে আমাকে বেঁধে নিয়ে ফেলে দেয়
অকল্যাণ ছাইয়ের পাহাড়ে।

মুক্তি! মুক্তি! —চীৎকার করতেই
উল্টে যায় আকাশ ; চোখের তারায় অনুভবে টের পাই
প্রচণ্ড ঝড় ও দহন একই সঙ্গে মল্লযুদ্ধে মত্ত।
তারপর হঠাৎই ঝড়ো-পাতায় উপনিষদের নৌকো,
চমকে তাকাতেই তুফান, ঢেউ চৈতন্য সমুদ্রের!
প্রেমের পাটাতনে পা রেখে অবশেষে পাই নিস্তার,
সূর্য মধ্যগগনে দাঁড়িয়ে সহাস্যে খুলে দেয়
আমার মহুয়াফলের আঠালো পোশাক।

আদিব্রহ্ম মাছ

অগ্নিস্বাক্ষর কই ?   কই বোধের ভেতরে সন্ধান সূর্যঘড়ির ?
কোথায় প্রজ্ঞার পাখিরা সব ?—নাগফণীর ছায়া কাঁপে
অস্থির জলে ; নিকটে কেউ নেই।   সম্মুখে শূন্যতা
বক্রঘুড়ি হয়ে উড়ছে ; হাতে নেই জ্যামিতির প্যাঁচ
কিংবা কোনো ঈশিত্বের জাদুদণ্ড, যা দিয়ে
ঠেকাতে পারি পেকোদের গতিবিধি।   চৈতন্য
লাফিয়ে ডুবে যাচ্ছে পাতালে।   (আমিও।   এই মুহূর্তে
আমার কোনো ধ্যানেই মন বসছে না।   মনে হচ্ছে
কয়েকটা বিষাক্ত কীট কামড়ে-কামড়ে খাচ্ছে আমার
কুণ্ডলিনী মূলাধার।   কোনো ছিটে-ফোঁটা আগুনের
শেকড় নেই, যা সময়ে-সময়ে জ্বলে উঠতে পারে
প্রাচীন ঋষিদের ব্রহ্মতেজ হয়ে।)

মগজে দুঃশ্চিন্তার সুতো বুনতে-বুনতে কেটে যাচ্ছে সময় ;
একজনও এমন কেউ নওল কবিও নেই—যাকে ডেকে
বলতে পারি : দাঁড় টেনে ভাসা নই অনন্তের দিকে।
আর চারপাশে শব্দের মায়াজাল ছিঁড়ে টপাটপ তোল দিকি
পৃথিবীর গুপ্ত অক্ষর, অমৃতের মউনি—আদিব্রহ্ম মাছ !

মোতিচাঁদ

আমার চোখে ইদানীং জ্বলছে অগ্নি দাউ দাউ
যেন রাবণের চিতা ; ভয় পেয়ে শহরের যুবতীরা
অলি হয়ে উড়ে যায় কর্পূর বাতাসে।
'ফুঁ' দিয়ে না ঝাড়তেই আপনিই ঝরে যায়
প্রেম, প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা
'কমা' থেকে পূর্ণচ্ছেদে !
একটা চোখ হাজার চোখ হয়ে আমিকে খাচ্ছে ;
যতবারই উজ্জ্বল নীলের পোশাকে
অহংকারের তলোয়ার ঝলসিয়ে-ঝলসিয়ে
ধরতে গেছি শরবনে আধফালি মোতিচাঁদ—
পিছলে গেছে তেলচিটা পয়সার মতন
অন্ধকারের নগ্ন পাতকুয়োয় ; জ্বলেনি লক্ষ নূপুর
পোষমানা ময়ূরীর পায়ে-পায়ে।

দাউ দাউ রাবণের চিতায় জ্বলছে, কেবলই জ্বলছে
দেবদূতের সাঁকো, বিষ্ণুচক্র ও ভগবান !

ভাউলে

হাপরে শীতলতা।
হৃৎপিণ্ডে বুঝি নেমে এল তুষার !
খপুষ্প-মাদুরে বসে বসে
কি করে তাতাবি তুই
একচক্ষু সিংহকে ?
প্রতিচিত্র ভেঙে
শিমুলের পোশাক ফেলে
চল যাই ভাউলে।
ব্রহ্ম ডাঙ্গায় কে আর অসময়ে
ফলিয়েছে শালিধান, কলমা ?
বাংচিতা দিয়ে কে বেঁধেছে বাঁধ
তুফান সমুদ্রের !
কালমেঘের শতরঞ্চ খেলা ভেঙে
ভিমরাজ আকাশে উড়িয়ে
চল যাই ভাউলে।

স্থিরচিত্র

উঠোনে বেউড় বাঁশের বেড়া। যতই অতল গভীর থেকে তুলে আনি মায়াবিনী চোখ, বাঁশির শব্দ, লবঙ্গবনের গল্প ; বার-বার ভেঙে যায় স্থিরচিত্র। একটা ক্ষয়াটে মানুষের বন্দীমুখ ভেসে ওঠে। শেকল-জড়ানো রাত্রির পোশাকে কয়েকটা কাল-কাল ছায়া নিবিড়ভাবে খুন করে বসন্তবাতাসকে।

বার-বার ভেঙে যায় স্থিরচিত্র॥

আনন্দ চরাচর

মেহগিনি চাঁদের গা থেকে টুপ্‌ টুপ্‌ ঝরছে
ক্লান্তি ঘাম ; মউবনে প্রেমিক নেই—
একান্ত নিরালায় দাঁড়িয়ে আছে দুই চোর
সঙ্গে তাদের কুটিল পোশাক ;
পৃথিবীর দীপ্তপ্রভা লণ্ঠন চুরি করে তারা
চরিতার্থ করতে চায় ব্যক্তিগত কামের উনুন জ্বেলে
ইন্দ্রিয়বিলাস।
স্বভাবে তারা সুচতুর শেয়াল ; ওৎ পেতে আছে
সময়ের অপেক্ষায়।

কাছে-পিঠে যারা আছে সব স্থবির , নিজেদেরই মুদ্রাদোষে
নিজেরাই বিক্রীত আজ। মগজে স্ফীত তন্ত্রীগুলো
শোনায় না কোনো নতুন আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর
শিহরণের দীর্ঘ ইতিহাস। যা গড়তে পারে একটা
সমাজ, একটা প্রেমিক ভূমণ্ডলের
ভূখণ্ড, বেগবান নদী—
ফুল ও পাতায় কোটীবছরের সতেজ যৌবন।

কবিরা কি পারে ?—ভেবে ভেবে মাথা ঝাঁকাতেই
লক্ষ লক্ষ লাল পিঁপড়েরা আমাকে গণ্ডী কেটে
বন্দী করে , সময় ভেঙ্‌চি কেটে বলে :
এই শালা, শক্তির পূজারী—প্রেমিক মানুষ
নিজেকেই আগে দ্যাখ—
সার্টের ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে কত শতাব্দীর ঘুণ ;
কি করে গড়বি তুই পুরনো ছাঁচে
মা বসুন্ধরার শ্রীমুখ, নিভুল অঙ্ক কষে
সত্যযুগ—আনন্দ চরাচর !

পাখি

একদিন স্বপ্নের গতিপথে উড়তে-উড়তে একটা পাখি হঠাৎই অন্ধকার
হিম-হিম কুয়াশার নদীতে ডুবে গেল। ভেসে রইল শুধু স্থির
ঢেউহীন জলে তার দুটো চোখ, একটা লাল ঠোঁট।

সেই দুটো চোখ আজ লক্ষ তলোয়ার হয়ে
প্রতিদিন রাতে আমার হৃৎপিণ্ডকে পাথরের টেবিলে রেখে
অপারেশন করে ;

লাল ঠোঁট লক্ষ আলপিন হয়ে
সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙে
বোধের ভেতরে রচনা করে এক জটিল জ্যামিতি।

সেই থেকে আমার আত্মার গায়ে
কোনো শৌখিন জামা নেই !

হরিণ বাড়ি

ভবার্ণবের জটিল-চক্রের
হরিণ বাড়ির কপাট ভেঙে
নির্জনতায় ধ্যানমগ্ন হলে
হৃৎপিণ্ডের ভেতরে কথা বলে
এক আলোর পুরুষ

সেই আলোর পুরুষ
তার নীলাভ চোখ রেখে
পর্যবেক্ষণ করে আমাকে ;
আর তখন আমি
নিজেরই ভেতরে উপলব্ধি করি
অন্য আমি, অন্য মানুষ

নির্জনতার ভেতরে ধ্যানমগ্ন হলে
খুলে যায় আমার সব অলংকার !

সংসার

সংসার জটিল-চক্র।
সুখে-অসুখেও
নাগফণী ; শান্তিহীন,
বেঁউতি-জালের মতন
জড়ায় নিন্দুকে, হৃদয়ে-হৃদয়ে
সংঘাত। একলক্ষ গিনিতেও
তুষ্ট নয় গৃহী ; যতই দেবে
সমুদ্র দূরে থাকে—নিকটে
আসে না। লক্ষ্মীর ঝাঁপি
অথৈ—ভরে না কিছুতেই।

শান্তি কই ? শান্তি কই ?
যত উটের মতো মুখ করে
তাকাই বাতাসে—ততই
শরীরে নামে ক্লান্তি ;
মগজের কোষে-কোষে
দাঁড়াশের উপদ্রব : ভাঙে
স্বপ্ন-সুধা, অমৃতের ভৃঙ্গার।

চক্রে চক্রে ঘোরে পার্থিব-অপার্থিব
তরক্ষু, গৃধ্নু, কপট ও জাদুকর !

বনিতা

বাইরে শব্দ করকার।
আয়, কাছে আয় বনিতা
ওম দিই—
ইস্ক্রু দিয়ে এঁটে দিই
প্রেম, সাবেকী বন্ধন ;
জলছাপ আয়না মুছে
রঙ দিই—বাসন্তী প্রলেপ।
একঝাঁক শিলীমুখ ওড়াই
খোলা জানলায় ; কবিতার ছন্দে
ভাসাই এই শরীর, গুপ্ত দাহ
অমিয়-সাগরে।

সন্তানহীনা বনিতা রে—
আয় তোকে বীজ দিই, তুই হ
পুত্রবতী ; নবীন প্রজন্মের মা !

জ্যোৎস্নার খাপ

জ্যোৎস্নার খাপে ভরে নিয়ে আমি যতই তাকে
শিল্প-সুষমায় গড়ে তুলি এক একটা-উজ্জ্বল ফুল
ততই দেখি, আদিম হিংস্র অচৈতন্যের হাঁ আমাকে গিলছে ,
হাওয়ার ভেতরে, জলের ভেতরে দস্যুর রণ-পা।
খুনীচাঁদের তনু ক্ষয়রোগে ক্ষীণকায় ; ঠাণ্ডা লাশের মতন
চুপচাপ শুয়ে থাকে সে আমার স্বপ্নের ঝাউবন, বকুলবাগানে।

জ্যোৎস্নার খাপে ভরে নিয়ে আমি তাকে পরিয়ে দেবো
প্রাজ্ঞবোধের জামা, ঈশ্বরের সেফটিপিন ?—ভাবতেই
মস্তিষ্কের ভেতর শুরু হয়ে যায় ডমরুনাচ।
অবশেষে বরফের চাদরে অদৃশ্য নিয়তি আমার
ঢেকে দেয় শতাব্দীর বিজ্ঞাপনের লালসূর্য, অমরাবতীর
শাদা ঘোড়া, সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখে-থাকার
গেরস্থ আলপনা, প্রশংসা-মানপত্রের স্বর্ণাভ বর্ণমালা।

জ্যোৎস্নার খাপতো নয়—যেন মৃত্যুর সমন
টের পাই লোভ-কাম-ভ্রষ্টাচার মোজায়েক বর্তুল পৃথিবীর
খুনী সময়ের কাছে দাঁড়িয়ে !

আমি ও প্রজন্ম

একটা আমিকে জড়িয়ে
আর একটা আমি
সামনে দাঁড়াল ; লৌ নাচে—
বাতাসে হল্কা,
একটা অচেনা পাখি ভোঁ ভাঁ উড়ে যায়
সমুদ্রের দিকে।

মুখ ঢাকি আরশিতে ; মনে হয়
একটা প্রজন্ম ধরে
আর একটা প্রজন্ম
শস্যের দানায় দাঁড়িয়ে
জলসিঞ্চনে আকাশ থেকে খুঁটে আনলো
কয়েকটা উজ্জ্বল নক্ষত্র।

একটা আমিকে জড়িয়ে
আর একটা আমি
একটা প্রজন্মকে ধরে
আর একটা প্রজন্ম
বৃক্ষ-ফুল-পাতার মোড়কে
গড়ে তোলে একে একে কয়েকটা দ্বীপ, কয়েকটা দেশ!

কামিনী-কাঞ্চন

ফুল কি খুলতে পারে জটিল-বোধের
সকল জং-ধরা শেকলের কুয়াশা ?

পাখি কি ভাঙতে পারে
জমাট বরফের পাথুরে রাত্রির অহংকার ?

আদপে ফুল ও পাখি এক একটা প্রতীক
আমরা যেভাবে স্থাপন করি কল্পনার রঙে
সেভাবেই আচরণ করে।
কিংবা, মনে করতে পারো—জোড়া খাপ ;
বোধে ও ভাবে শান দিয়ে ভরে দাও প্রেমরূপী
চকচকে তলোয়ার—দেখবে : একটা ফুল
বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে হৃৎপিণ্ডে ; আর একটা পাখি
কাব্যের সুমিষ্ট-ঝালর পরে আগুনের মোড়কে
রচনা করে ফেলেছে কাশীরাম দাসের মতন
এক আশ্চর্য মহাভারত।
ফুল ও পাখি হলো প্রকৃতির জাদুদণ্ড ; যেভাবেই মনে মনে
ছুঁতে যাবে—দেখবে সেভাবেই তুমি পেয়ে গ্যাছো
এমনকি, কামিনী-কাঞ্চন !

শাঁখ

তাকে ছুঁতেই ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে বেজে উঠলো শাঁখ
সবুজ ঘাসের দেশ থেকে উঠে এসে একটা পাখি
দু'ঠোঁটে নাচালো পূর্ণিমার ঘন শাদা চাঁদ !

স্থবিরতা ভেঙে হৃদয়ের ভেতরে জেগে উঠে শিলীমুখ
বরফের জানলা ভেঙে উড়ে গেল স্বপ্নের শিমুল বাগানে ।
অতর্কিতে রুগ্ন-বোধের অনুর্বর মাটিতে নামলো বৃষ্টি ;
সেই থেকে শুরু হলো নবীন প্রজন্মভূমিতে
লাঙলের ফলার কর্ষণ, অফুরন্ত শস্যের চাষ ।

তাকে ছুঁতেই ওলোট পালোট হয়ে গেল
সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ, দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ !

অমিয়-কাঞ্চন

কে কি ভাবছে জানি না
আমি ভাবছি এক স্রোতস্বিনী উত্তাল নদীর কথা
কে কি ভাবছে জানি না
আমি ভাবছি মহাকালের সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন
প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

এভাবেই কি দিনযাপন ভালো সবুজঘাসের চিত্রিত
আল্পনা, আর ঋতুমতী-চাঁদের গল্প বলে
বোধের সহজ সেলাইয়ে স্বপ্নকে ব্রবণ করে
আত্মার গায়ে ভিজে ভিজে পোশাকে আধুনিকীকরণ ?

না, এভাবে না—অন্যভাবে
চিত্রিত আল্পনা, আর স্বপ্নের শুধু বন্দনাগীত নয়,
উত্তাল নদীর কথা চাই, মহাকালের সঙ্গে চাই
এক নেশাঘোর মাদকের মতন খেলার সম্পর্ক।

মহাকালইতো দিতে পারে সেই অমিয়-কাঞ্চন, সুধারস
যা নতুন, সম্পূর্ণ এক অবিভাজ্য অনন্তবৃক্ষের শেকড় ;
যে শেকড়ে-শেকড়ে জড়ানোয় যত থাক অতৃপ্তি, অবিজ্ঞাপন
তবু তা শিল্পের সুষমায় একক মনন ব্যক্তিত্ব
ছুঁলেই ঘর্ষণে একদিন শব্দ সব ব্রহ্ম হয়ে যায়, তারপর
চিত্রকল্প, ছন্দ সবকিছু তেজরশ্মি সূর্যের সন্তান !

আর্যপুরুষ

দ্রাবিড়সভ্যতা মাড়িয়ে
এসেছি আমি ;
বীর্যে ও শৌর্যে
এক আর্যপুরুষ।

দ্রবণের মতো
অঙ্গে মেখেছি
রক্ত ও প্রেম !

গাণ্ডীব তুলে
ভেঙেছি বাতাস
অবিমিশ্র অন্ধকার
জুজুভয় রাত।

আর্যপুরুষ আমি
বুঝি শুধু শৌর্য
এবং বীরত্বের
দীপ্ত ঝংকার।

আমার আঙুলে এবং
নখে এখনও রয়েছে
দ্যাখো—যুগযুগান্তরের
সৈনিক রোদ্দুর !